মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মেয়ের অলংকার সংস্কৃতির পরিচয়

মুগ্ধ মজুমদার, গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা

সংক্ষিপ্তসার ঃ

ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিক বামানাচার্য বলেছিলেন 'সৌন্দর্যম অলংকার'। অর্থাৎ অলংকারের মধ্যেই নিহিত আছে সৌন্দর্য। পরবর্তী কালে অলংকার শাস্ত্রে কাব্যকে তুলনা করা হয়েছে নারী দেহের সঙ্গে। গয়না যেমন সুন্দর করে তোলে নারীদেহকে, তেমনি অলংকারও ভূষিত করে কাব্যশরীরকে। তবে অলংকার বা গহনা নারীদেহের সৌন্দর্য সাধন করে ঠিকই, কিন্তু তার ব্যবহার হতে হবে পরিমিত ও মার্জিত। অর্থাৎ যতটুকু অলংকারে নারীদেহ দৃষ্টি-নন্দন হয় সেই পরিমাণ গয়না পরিধানই করা বিধেয়। কাব্যতাত্ত্বিকদের কুটতর্ককে সরিয়ে রেখে নারীর আভরণ বিষয়ে উল্লিখিত দৃষ্টান্তটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য জুড়ে অলংকারের যেসব প্রসঙ্গ এসেছে তার প্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে সেকালের মহিলারা কতখানি সৌন্দর্য সচেতন ছিলেন। শুধু ধাতব বা সোনা-রূপার গহনা দিয়েই যে তাঁরা শুধু বেশবাস করতেন তা নয়, মধ্যযুগে বাঙালি মেয়ের পরিধেও অলংকারের মধ্যে ছিল শঙ্খ, ঝিনুকের তৈরি গয়না। আবার ফুলের তৈরি গহনাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন রূপ গোস্বামী রাধার গয়নাগাটির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। অবশ্য আর্থ-সামাজিক অবস্থার মাপকাঠিতে মেয়েদের অলংকার ব্যবহারও বদলে যেত। সেকারণেই 'চর্যা'র পাহাড়িয়া শবরীর গয়নাগাটির সঙ্গে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বণিক কন্যা বেহুলার জড়োয়া অলংকারের ফারাক থেকে যায়। অর্থাৎ মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্যিক উপাদানের প্রেক্ষিতে একটি স্বল্পচর্চিত হলেও অলংকার সংস্কৃতির গভীর তাৎপর্য রয়েছে।

মূলশব্দগুচ্ছঃ মধ্যযুগ, অলংকার, বাঙালি মেয়ে, সংস্কৃতি।

১.

প্রাচীন ভারতীয় অলংকার তাত্ত্বিক বামানাচার্য বলেছিলেন 'সৌন্দর্যম অলংকার'। অর্থাৎ অলংকারের মধ্যেই নিহিত আছে সৌন্দর্য। পরবর্তী কালে অলংকার শাস্ত্রে কাব্যকে তুলনা করা হয়েছে নারী দেহের সঙ্গে। গয়না যেমন সুন্দর করে তোলে নারীদেহকে, তেমনি অলংকারও কাব্যশরীরকে ভূষিত করে। তবে অলংকার বা গহনা নারীদেহের সৌন্দর্য সাধন করে ঠিকই, কিন্তু তার ব্যবহার হতে হবে পরিমিত ও মার্জিত। যতটুকু অলংকারে নারীদেহ দৃষ্টি-নন্দন হয় সেই পরিমাণ গয়নাই পরিধান করা বিধেও। কাব্যতাত্ত্বিকদের কুটতর্ককে সরিয়ে রেখে নারীর আভরণ বিষয়ে উল্লিখিত দৃষ্টান্তটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

যদিও মধ্যযুগের সাধারণ বাঙালিনির যাপন ছিল খাঁচার পাখির মতনই। স্মৃতি-শ্রুতির বন্ধনে সেকালের নারীর জীবন ছিল শক্তশাসনে আঁটা। তবু সেই শেঁকলের গিঁটের মধ্যেও মেয়েরা নিজেদের সৌন্দর্য সাধনের ত্রুটি রাখেননি। কত রকম ভাবে নান্দনিক অলংকারে নিজেদের সজ্জিত ও অলংকৃত করে তোলা যায় তাঁর নিপুণ বর্ণনা পাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, টেরাকোটা নকশায় কিংবা কিঞ্চিৎ পুথি-পাটার চিত্রকলায়। অবশ্য মেয়েদের পরিধেও গহনা শুধু মধ্যযুগের বাঙালিনির গয়না সংস্কৃতিকেই পরিবেশন করেনা, গয়নার আদল, উপাদান ও নকশার কারুকার্যে উৎকীর্ণ মোটিফের মধ্যে ধরা থাকে সমকালীন বাঙালিজাতির রাজনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনচর্যার সামগ্রিক চালচিত্র। অলংকার নিয়ে সেকালের মেয়েরা কতটা সৌন্দর্য সচেতন ছিলেন তার নানান সূত্র ছড়িয়ে আছে বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে। যেমন উত্তর ভারতের একটি বিখ্যাত গঙ্গার ঘাটের নাম হয়েছে মণিকর্নিকা। অন্যদিকে হিমাচল প্রদেশের কুলুর কাছাকাছি একটি উষ্ণ প্রস্রবণযুক্ত গৌরী নদীবাহিত অঞ্চলের নাম হয়েছে মণিকরণ। লোকায়ত জন শ্রুতিতে বলা হয় এখানে দেবী পার্বতী স্নানকরতে এসে তাঁর কর্ণকুন্ডল হারিয়ে ফেলেছিলেন বলেই এই জাতীয় নামকরণ। পুরাণমতে সতীর দেহাংশের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত গয়না গুলি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পতিত হয়ে ওইসব গয়নার নামানুসারে বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তিপীঠের নামকরণ হয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সাইথিয়ায় দেবীর কণ্ঠী বা গলার হার পড়েছিল। মুর্শিদাবাদে পড়েছিল দেবীর কিরীট বা মুকুট এবং শক্তিপীঠের নাম হয়েছে কিরীটেশ্বরী। এছাড়াও বেদ-পুরাণে ছড়িয়ে আছে দেবদেবী ও রাজা রাজড়াদের মণিমুক্তাময় অলংকারের ব্যবহারের কথা। মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত সৌদাসের পত্নী মদয়ন্তীর কুণ্ডলটি ছিল রত্নখচিত। মহাভারতে নারীর আভরণ হিসেবে কেয়ূর, নিষ্ক, কম্বু, মুদ্রা প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের মহাবলীপুরমের রথমন্দিরসহ একাধিক মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মূর্তিতে অলংকারের ব্যবহার বিশেষ নজরকাড়ে। প্রাচীন ভারতে অলংকার তৈরির জন্য শিল্পী-সম্প্রদায়েরও বিশেষ ভূমিকা ছিল যার ঐতিহাসিক উল্লেখ পাই সপ্তম শতকের দিকে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে আগত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের 'ভারত বিবরণী' থেকে। বঙ্গদেশে রচিত 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'এও বিশ্বকর্মা ও ঘৃতাচীর নয়জন সন্তানের মধ্যে শিল্পীগোষ্ঠীর কথা রয়েছে। অলংকার নির্মাতা শিল্পীরাও ছিলেন এরই গোত্রভুক্ত।

২.

ক. মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে নারীর আভরণের কথা বলতে গিয়ে অষ্টালংকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মাথার ও চুলের অলংকার, নাকের অলংকার, কর্ণাভরন, কণ্ঠাভরণ, হাতে পরার অলংকার, কোমরে মেখলাজাতীয় অলংকার, পায়ের বিবিধ আভরণ। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যতে ও মধ্যযুগীয় বাংলায় এই অষ্টালংকার পরিধানের রীতিই প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এইসব অলংকার তৈরি হত পাথর, শঙ্খ বা ঝিনুক, ধাতুর এবং বিভিন্ন রঙিন ফুল দিয়ে। তবে বর্ধিষ্ণু বাড়ির মেয়েরাই মূলত সোনারূপো বা মনি-মুক্তার অলংকার ব্যবহার করতেন। নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণির মেয়েরা শঙ্খ, ঝনুক ও বনফুলের মালা ও কানের দুল পরতেন। অন্যদিকে বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধার অঙ্গাভরণের মধ্যে ফুলের ব্যবহারই বেশি। বৈষ্ণবীয় ঘরানায় ফুল দোল একটি বিশেষ উৎসব হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।

বাঙালি মেয়েদের অলংকারের প্রথম দিককার নিদর্শন পাওয়া যায় পাহাড়পুরের সোমপুরী মহাবিহারের টেরাকোটা প্যানেলে উৎকীর্ণ নারী ভাস্কর্যে। এছাড়া মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত যক্ষীর মূর্তীতে ব্যবহৃত চুলের বাঁধুনি, হাতের বালা, নথ প্রভৃতি অলংকারের নমুনা পাওয়া যায়। পাল ও সেন আমলে নির্মিত হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তিগুলির আভরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পালযুগে রচিত 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র চিত্রিত পুথিতেও দেব-দেবীদের ওইসব অলংকারগুলিই পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তাছাড়া ১২০৫ বঙ্গাব্দে শ্রীধরদাসের সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে এক অজ্ঞাতনামা কবির লেখা একটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে সে সময় বঙ্গ-বারাঙ্গনারা কর্ণভূষণ হিসেবে তালপাতার নকসা করা দুল ব্যবহার করতেন-"কর্ণোত্তংসেনব শশিকলানির্মলং তালপত্রং/ বেশঃ কেষাং ন হরতি মনোবঙ্গবারাঙ্গনানাম"।

খ. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নথি 'চর্যাপদ'এ অন্ত্যজ জীবন থেকে উঠে আসা মেয়েদের সাজগোজের কিছু কিছু বর্ণনা রয়েছে। যেমন দুই সংখ্যক চর্যায় বলা হয়েছে- "কানেট (কর্ণকুণ্ডল) চৌরি নিল অধরাতী"। এগারো সংখ্যক চর্যায় পাই নূপুর ও কর্ণাভরণের প্রসঙ্গ। আঠাশ সংখ্যক চর্যায় বলা হচ্ছে-

"উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।"[১]

অর্থাৎ এখানে পাহাড়িয়া শবরী বালিকার গলার গুঞ্জা ফুলের মালা ও চুলে ময়ুরের পেখম দিয়ে সাজবার প্রসঙ্গ এসেছে যা অভাব-অনটনে ধ্বস্ত নিম্নবর্গের মেয়েদের আভরণের কথাই মনে করিয়ে দেয়। অন্যদিকে বত্রিশ ও চুয়াল্লিশ সংখ্যক চর্যায় মেয়েদের হাতের কঙ্কণ বা বালার উল্লেখ রয়েছে।

"হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ।"২ (৩২ সংখ্যক)
"ভণই কঙ্কণ কলএল সাঁদে।"৩ (৪৪ সংখ্যক)

গ. মঙ্গলকাব্যের মধ্যে 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা কবির সংখ্যা বেশি হলেও এই কাব্যে সেইভাবে অলংকারের বর্ণনা তুলনায় কম। তবে মনসার নাগ-আভরণ থেকে সেকালের বাঙালি মেয়েরা মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কী কী অলংকার পরতেন তার অনুমান করা যায়। বিজয়গুপ্তের কাব্যে বলা হয়েছে-

"পরিধানে পাটের শাড়ি কোমরে তক্ষক।
মহাপদ্মের হার পরে কেয়ূর কুরুবক।।
আরড়িয়া বেঁকা নাগে করিল আসন।
পাটেশ্বরী নাগে পদ্মা করিল বসন।।
খইয়া জাতি নাগে পদ্মার হাতের বড় শোভা।
বিঘতিয়া নাগে মাথায় বান্ধে খোঁপা।।
কুণ্ডলিয়া নাগে পদ্মার কর্ণের কুণ্ডলী।।
জাতি সর্প দিয়া বান্ধে মাথার পুটলী।।
সিন্দুরিয়া নাগে পদ্মার ললাটে সিন্দুর।
বিঘতিয়া বেড়া নাগে চরণ নূপুর।।"[৪]

বস্তুত 'মনসামঙ্গল' এর নায়িকা বেহুলার জীবনের মূল লক্ষ্যপূরণ মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা। চাঁদ বেণের বাড়িতে লখীন্দরের মৃত্যুর পর সাত জন বিধবা পুত্রবধূর জীবন প্রকৃত প্রস্তাবেই অলংকার-হীন।

তবে নারায়ণ দেবের 'মনসামঙ্গল'এ পাই বিবাহের দিন বেহুলার সাজসজ্জার বিবরণ-

"সূর্য্যমণ্ডল দুই যেন কর্ণের কুণ্ডল।
সুবন্তের চাবি বলি তাহার উপর।।
গলায় পরিল বেউলা নব লক্ষের হার।
বাহুতে পরিল বেউলা সুবন্তের চাইর তাড়।।
আভের কাকৈ দিয়া পাইট কৈল সিথি।
নাসিকা উপরে দিলা রত্ন গজমুতি।।
তোড়ল-মল পরিলা নপুর চরনে।
সংসার মুহিত করে বেউলার সাজনে।।...
সিথিত সিন্দুর পরে সোনার পত্রাবলি।
বাহুটী পরিলা যার পায়ত পাসুলি।।..."[৫]

নানাদেশে পাড়ি জমানো সায়বেণের মেয়ে বেহুলার সাজগোজ যে বেশ রাজকীয় হবে তাতে সন্দেহ নেই। এখানে বেহুলার কণ্ঠের যে নবলক্ষের হারের কথা বলা হয়েছে তা মূলত নয়-লহরী হার। পুরনো দিনে এইজাতীয় ছড়া হারের বিশেষ প্রচলন ছিল। হারের ছড়া বা লহরের সংখ্যা অনুয়ায়ী তার নাম দেওয়া হত দোসরি, তেসরি, সাতসরি প্রভৃতি। আবার ছড়ার সংখ্যা খুব বেশি হলে তাকে বলা হত 'দেবচ্ছন্দ'। তেমনি নাকের নথও হত নানা রকমের। যেমন- বোলাক, নাকমাছি, নোলক এবং জুঁই, বেল, করবী প্রভৃতি ফুলের আকৃতিতেও নথ তৈরি করা হত।

নারায়ণ দেবের কাব্য থেকে আরো জানা যায় বেহুলা-লখাইয়ের বিবাহের পরের দিন সদ্যবিবাহিত কনে-জামাইকে রান্না করে খাইয়েছেন বেহুলার মা তারকা রানি। রান্নার সময় তাঁর কানের দুলটিও যে মৃদুমৃদু নড়ছিল তার বাস্তবধর্মী বর্ণনা পাই কবির কলমে-

"রন্ধন রান্ধে তারকা কানের লড়ে সোনা।
আমচুর দিয়া রান্ধে সৌল মৎসের পোনা।।"[৬]

ঘ. কবির নাম মুকুন্দ চক্রবর্তী। কবির নামের সঙ্গেই রয়েছে 'কবিকঙ্কণ'অভিধা। কবিত্বের শ্রেষ্ঠতাকে উপমিত করা হয়েছে হাতের অলংকারের সঙ্গে। কবির লেখনী এতটাই ঋদ্ধ! কবি মুকুন্দবিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বারবার পাই সেকালের অলংকারের প্রসঙ্গ। যেমন ধনপতি দ্বিতীয় বিবাহ করার সময় প্রথম স্ত্রী লহনার মন রেখেছিলেন গয়নাগাটি দিয়ে "পাঁচ পণ সোনা দিল পরিবারে চুড়ি"। সেকালে মহিলাদের হাতে রাখতে বা মানভাঙাতে গহনা উপহার দেওয়াই ছিল পুরুষদের একমাত্র আয়ুধ। মহিলা মহলও যে অলংকারে সহজেই মজতেন বলাবাহুল্য। এরপর খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির বিবাহপালা। একালের মতো সেকালেও বিবাহের যৌতুকে অলংকার দেওয়ার রীতি চালু ছিল-"পঞ্চরত্ন হাথে দিল সাধুর মহিলা"। বাসরে ধনপতি তাঁর নব পরিণীতা বধূকে উপহার দিয়েছিলেন গৌড় থেকে আনা "অঙ্গুরি পাসুলি ছটি/ সুবর্ণর গড়ি কাঁঠি/ মণিমুতি (মোতি বা মুক্তা?) পলা হেম হার"। শ্বশুর বাড়ি গিয়ে নববধূ খুল্লনার সাজের নিখুঁত বর্ণনা পাই কবি মুকুন্দের লেখনীতে-

"রজত পাসুলি ছটী পরে দিব্য তুলা কোটি
বাহুবিভূষণ ঝলমলি।
পরে দিব্য পাট সাড়ি কনকের গড়ি চুড়ি
দু-করে কুলপী শোভে শঙ্খ
হিরা নিলা মুতি পলা কল ধৌত কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ পঙ্ক।
নানা অলঙ্কার পরি ডানি করে হেমঝারি
বাম করে তাম্বূল সাঁপুড়া
সুনাদ নূপুর পায় কুঞ্জর গামিনী জায়
লহনা সুনিতে পাইল সাড়া।"[৭]

বণিক পর্বের ধনপতি আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডে বর্ধিষ্ণু হওয়ার কারণেই তাঁর স্ত্রীরা পলা, মুক্তো, নিলা প্রভৃতি মূল্যবান গয়নার অলংকার পরিধানের সুযোগ পায়। অথচ ব্যাধপর্বের ফুল্লরা-কালকেতু আখ্যানে ফুল্লরার দারিদ্র অবস্থায় যাপিত পর্বে কোনো অলংকারেরই

হদিস পাওয়া যায়না। শুধু তাই নয় ফুল্লরার বারমাস্যার দীর্ঘ তালিকায় তাঁর মূল সংকট খাদ্য নিয়ে। যেখানে রুটিরুজির তাড়নায় যাপনের বেশিরভাগ টুকুই চলে যায় পেটের খিদে মেটানোর তাগিদে, সেখানে কি গহনা বিলাস আদৌ শোভা পায়? মুকুন্দের অন্তর্দৃষ্টিতে তাই নিরন্ন ফুল্লরাকে অলংকারে নয়, খাদ্য সংকটে আহত হতে হয়।

ঙ. পূর্বোদ্ধৃত বিবাহসজ্জার আরেকটি বর্ণনা পাই রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে। সেখানে রুক্মিণীর বিবাহে নান্দীমুখে দেখা যায় অভ্যাগতদের ভিড়। "সকলের কর্ণমূলে/ কনককুণ্ডল দোলে/ প্রতি কণ্ঠে কাঞ্চনের হার"। এছাড়া রুক্মিণীর সাজগোজের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে 'রসাল কিঙ্কিণী' ও 'নূপুর'এর প্রসঙ্গকথা।

'শিবায়ন'এর গৌরী ও শিবের মূল আখ্যানে শিবসংসারে গৌরীর আগমন, সন্তান হওয়া, অন্ন-সংকটের মতো নানা দুঃখ-সুখের কথা রয়েছে। শিবের শূল বাঁধা দিয়ে গৌরীকে সংসার চালাতে হয়। এখানে ঠিক 'দেবী' গৌরী নয়, সেকালের চিরন্তন বাঙালি ঘরের 'গৃহস্থ বউ'গৌরীর ছবিই চিত্রিত হয়েছে। অভাব অনটনের দিনে স্বামী-সন্তানদের খাবার দেওয়ার সময় গৌরীর হাতের বালা আর পায়ের মলের রুনু রুনু শব্দ মুখর করেছে সেই ভোজন অধ্যায়কে-

"চঞ্চল চরণেতে নূপুর বাজে আর।
রুণু রুণু কিঙ্গিণী কঙ্কণ ঝনৎকার।।
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হইল সজল সকল কলেবর।।
ইন্দু মুখে মন্দ মন্দ ধর্ম বিন্দুসাজে।
মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে।।"[৮]

কাহিনির শেষপর্বে মান-অভিমানের পালা কাটলে গৌরীকে শিবের শঙ্খ পরানোর সময় দেখতে পাই গৌরীর অলংকার সজ্জার খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ। যেমন- মাথার চূড়ায় চূড়ামণি দীপিকা, কর্ণমূলে কুণ্ডল, নাসামূলে নথ, মণিমুক্তার কণ্ঠহার, কনক বা সোনার চুড়ি, বাহুতে অঙ্গদ ও বাজুবন্ধ, রত্নের আংটি, রত্নখচিত নূপুর, পায়ের পদাঙ্গুলে রত্নময় পাশুলি প্রভৃতি।

চ. অনুবাদ কাব্যের মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দির কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'এর কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। শুধু আখ্যানে, আচারে ও আহারেই নয়, বাল্মীকির মহাকাব্যিক রাম-সীতা ও অন্যান্যরাও বাঙালিয়ানায় আধারিত হয়েছে কবি কৃত্তিবাসের প্রতিভায়। রাম-সীতার বিবাহে যখন সীতার পরনের অলংকারের বিবরণ পাই তখন সেই বাঙালিয়ানার ধাঁচাটিই যেন পুনরাবৃত হতে দেখা যায়-

"নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে।।
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি।।
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়।।
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোনার কঙ্কণ।।
দুই পায়ে দিল তার ব্যঞ্জন নূপুর।
কপালে তিলক আর নির্মল সিন্দূর।।"[৯]

উল্লিখিত বেসর একজাতীয় নাকের ভূষণবিশেষ। সীতার বাহুতে ব্যবহৃত তাড়বালার কথা মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যেও পাওয়া যায়। মধ্যযুগে মেয়েদের মতো পুরুষরাও তাড়বালা পরিধান করতেন। খুল্লনাকে বিবাহ করার সময় ধনপতির সজ্জাতেও তাড়বালার উল্লেখ পাই। বড়োলোকি আদবকায়দার অলংকারে ব্যবহৃত ধাতুর মধ্যে সোনাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হত।

ছ. অবৈষ্ণব কাব্যের পর বৈষ্ণব ও চৈতন্যজীবনী গ্রন্থেও এসেছে মেয়েদের গয়নাগাটির কথা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের আদিলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা দিয়েছেন নিমাইয়ের জন্মের পর মিশ্রবাড়িতে আগত অভ্যাগতদের। সেদিন শিশুনিমাইকে যাঁরা যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতা ঠাকুরানী। মঙ্গলদ্রব্য সমেত নানা উপহার এনেছিলেন তিনি ছোট্ট নিমাইয়ের জন্য। কৃষ্ণদাস এখানে নিঁখুত বর্ণনা দিয়েছেন সেকালের স্বচ্ছল-শৌখিণ ও রুচিশীল বাঙালি বধূ সীতার-

"সুবর্ণের কড়ি বোলি রজত মুদ্রা পাশুলি
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দুই বাহু দিব্য শঙ্খ রজতের মল বঙ্ক
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ।।
ব্যাঘ্র নখ হেমে জড়ি কটি পট্ট সুত্র ডোরি
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্র বর্ণ পট্ট সাড়ী ভুনি ফোতা পট্ট পাড়ী
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন।।"[১০]

সীতা ঠাকুরানীর সাজগোজে তাঁর অলংকারপ্রীতিই মুদ্রিত হয়েছে। সেকালের সধবা নারীরা উৎসব অনুষ্ঠানের মুহূর্তে কীভাবে সাজতেন তাও এখানে স্পষ্ট। সোনার তৈরি হাতের বাজুজাতীয় অঙ্গদ থেকে হাতের কঙ্কণ বা বালা থেকে পদাঙ্গুলে পরবার জন্য রূপোর তৈরি মুদ্রার মতো আংটিও বাদ যায়নি।

এছাড়া জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে নিমাইয়ের দ্বিতীয় বিবাহের দিন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পরিধেও অলংকারের-

"জল কাললিত ভালে কবরী কুসুম মালে
চন্দন তিলক বিন্দুলয়ে।
হার কুণ্ডল শ্রুতি পঙ্কজলোচন দ্যুতি
শরদ বিশদ মুখ নয়ে।...
কেয়ূর কঙ্কণহার প্রবাল মোতিক মাল
ক্ষৌম বাস দিব্য শঙ্খ হাথে। "[১১]

৩.

আগেই বলা হয়েছে সেকালে মেয়েদের অলংকার সজ্জার ধরন পালটে যেত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে। মণি-মুক্তা খচিত গয়না পরিধানের ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য ছিল না নিম্নবর্গের মেয়েদের। তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উল্লিখিত নারীর পরিধেও গয়নাগাটির মধ্য বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে সোনা ও রূপোর অলংকার। 'মধ্যযুগে বাংলা' বইতে ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ রায় মনে করেছেন মধ্যযুগে চট্টগ্রাম ও পরে সপ্তগ্রাম বন্দরের মারফৎ সোনারূপার মতো মূল্যবান ধাতু আমদানী- রপ্তানি হত। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বস্তুবদল পালায় দেখা যায় দক্ষিণ পাটনে গিয়ে চাঁদ বণিকের কুমড়োর পরিবর্তে সোনা কেনবার কথা-"হরিদ্রা বদলে সোনা ভাল হইল রে"। কিংবা দক্ষিণ পাটনের রাজার "সোনার টোপর রাখি খাটের উপর" জাতীয় কথায় বোঝা যায় সেই সময় বাংলায় সোনার আমদানি চলত। তবে সোনার চেয়েও রূপোর বাণিজ্য বেশি চলত। বাঙালি সুলতানদের রাজত্বকালে প্রবর্তিত সোনা-রূপোর মুদ্রাগুলি থেকেই বোঝা যায় সেকালের বাংলায় ওইসব ধাতুর প্রচলন ছিল যথেষ্ট বেশি। তবে ধাতু হোক বা রত্ন, এইসব মূল্যবান দ্রব্যগুলি দিয়ে তৈরি অলংকারাদি মূলত বণিক পরিবারের অন্দরমহলকে সুসজ্জিত করত। বণিকদের বৈভবের প্রতীক ছিল ওইসব মূল্যবান রত্নবস্তু ও অলংকার। উদাহরণ হিসেবে চাঁদ বণিক, ধনপতি সদাগরের পরিবারের কথা বলতে পারি। তাছাড়া সেকালে সুবর্ণ বণিক বা সোনার বেণেদের কথাও পাওয়া যায়। বল্লাল সেনের আমল থেকে যারা নবশাখ গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল। বাংলার মধ্যযুগের পর্বে সোনা-রূপো বা শঙ্খ বা পুষ্পাভরণের জনপ্রিয়তা থাকলেও তা মূলত হিন্দু জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল বেশি। ত্রয়োদশ শতক থেকে বাংলায় ঐস্লামিক শাসন প্রতিষ্ঠা হলে ভারত তথা বাংলার ইসলাম সম্প্রদায়ের মধ্যে জরোয়া গয়নার আদর ক্রমশ বাড়তে থাকে। বাংলার বেগম-সুলতানদের ছবিতে পরনের গয়নাগাটি গুলিই তার প্রমাণ। তবে তা যে উচ্চবিত্ত ইসলামদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল বলাবাহুল্য। অনুমান করা শক্ত নয়, অন্ত্যজ হিন্দু-মুসলীম নারীদের যাপনে অলংকারের খুব বেশি তফাৎ ছিল না। অষ্টাদশ শতক থেকে বাংলায় বিদেশী বণিকের আগমন ও মুঘল রাজতন্ত্রের যুগে বঙ্গীয় জমিদার ও রাজাদের মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজে অজস্র গয়নাগাটির উল্লেখ পাই। মেয়েমহলে অলংকারের জৌলুস যে ক্রমশ বেড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এমনকি উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্ব পর্যন্ত কলকাতা কেন্দ্রিক নব্যসংস্কৃতির ছোঁয়ায় অনেক কিছুর আদবকায়দা বদলে গেলেও অন্দরমহলের অলংকারচর্চা ছিল মূলত পুরনো টানেই বওয়া। উনিশের নারীদের আত্মজীবনীগুলি তার সাক্ষ্য। বিশেষত কৈলাসবাসিনী দেবীর লেখায় গয়নাগাটির দীর্ঘ ফর্দ পাওয়া যায় যা মধ্যযুগের বাঙালিনির ব্যবহৃত অংলকারমালা কেই মনে করিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. নির্মল দাশ সম্পাদিত চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১২, পৃঃ- ১৮০-১৮১।

২. ঐ, পৃঃ- ১৮৮।

৩. ঐ, পৃঃ- ২১৩।

৪. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, অঞ্জলি পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃঃ- ৩০৭।

৫. তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, সুকবি নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃঃ-৫২।

৬. ঐ, পৃঃ- ৫৭।

৭. সুকুমার সেন সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭, পৃঃ ১৬১।

৮. যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃঃ- ১০৫।

৯. সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃত্তিবাস পণ্ডিত-বিরচিত রামায়ণ, আগস্ট ২০১৫, পৃঃ- ১২৮।

১০. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ পাবলিশার্স, চৈত্র ১৪১৭, পৃঃ ৮২।

১১. সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সুমঙ্গল রাণা সম্পাদিত, জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃঃ- ৫০।